আত্মচেতনা

আমরা দেখেছি প্রাচীন ভারতবর্ষের উচ্চাশা ছিল তার চেতনার ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বে বিস্তার ক'রে ব্রহ্মের মধ্যে জীবিত থাকা ও বিচরণ করা ও আনন্দ লাভ করা, এই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী আত্মা। কিন্তু, দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে মানুষের পক্ষে এই কাজে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। চেতনার এই বিস্তার যদি এক বাহ্য প্রক্রিয়া হয়, তা হলে তা হবে অন্তহীন; এ যেন হাতা দিয়ে জল তুলে ফেলে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা। এক সঙ্গে সব কিছু উপলব্ধি করার চেষ্টা যদি কেউ শুরু করে, তা হলে কোনো কিছু উপলব্ধি না ক'রে তাকে শেষ করতে হবে।

কিন্তু, বাস্তবে, এই কাজ তত অদ্ভুত নয় যত শুনতে মনে হচ্ছে। মানুষকে প্রতিদিন তার এই ক্ষেত্র বিস্তারের সমস্যা মিটাতে হয় ও সমস্ত দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার দায়িত্ব অনেক, বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সংখ্যায় খুবই বেশী, কিন্তু সে জানে কোনো একটি নিয়ম অবলম্বন করলে সে তার দায়িত্বভার লাঘব ক'রে নিতে পারে। যখনই সেগুলি জটিল ও অবিন্যস্ত মনে হয়, তখন সে জানে এর কারণ হলো যে নিয়ম সব কিছুকে ঠিক জায়গায় স্থাপন করবে আর সমান ভাবে সব দায়িত্ব ভাগ ক'রে দেবে সেই নিয়ম সে আবিষ্কার করতে পারেনি। নিয়মের এই অনুসন্ধান আসলে ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের অনুসন্ধান;

আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দিয়ে বাহ্যিক উপাদানের জটিলতার সমন্বয় স্থাপন করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা ক্রমশ বুঝতে পারি যে এককে খুঁজে পেতে হলে সর্বময়কে অধিকার করতে হয়; প্রকৃতপক্ষে, এ আমাদের চরম ও সর্বোচ্চ অধিকার। এই অধিকার ঐক্যের সেই নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত যা আমাদের অবিরাম শক্তি যোগায়, যদি অবশ্য আমরা তা জানি। এই সক্রিয় নিয়মের শক্তি রয়েছে সত্যের মধ্যে; ঐক্যের সেই সত্য সর্বময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তথ্য অনেক, কিন্তু সত্য এক। জীবজন্তুর বুদ্ধি তথ্য জানে, মানুষের মন সত্য অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখে। গাছ থেকে আপেল পড়ে, মাটির উপরে বৃষ্টি নেমে আসে— এই ধরনের তথ্যে তুমি তোমার স্মৃতি ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে পারো ও কখনোই শেষ না করতে পারো। কিন্তু একবার যদি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আয়ত্ত করতে পারো তা হলে অনন্তকাল ধরে তথ্য সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ পাবে। কারণ অসংখ্য তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী এক সত্য তুমি লাভ করেছো। সত্যের এই আবিষ্কারে মানুষের নির্মল আনন্দ— এ তার মনের মুক্তি। তার কারণ, শুধু তথ্য একটি অন্ধ গলির মতো, সে কেবল নিজের দিকেই পথ দেখায়— নিজের বাইরে এর কিছু নেই। কিন্তু একটি সত্য সমগ্র দিগন্ত খুলে দেয়, সে আমাদের অসীমের দিকে নিয়ে যায়। এই যুক্তি অনুযায়ী ডারউইনের মতো মানুষ যখন জীববিদ্যার একটি সহজ সাধারণ সত্য আবিষ্কার করেন, তখন সেখানেই তা থেমে যায় না, বরং তা মূল লক্ষ্য অতিক্রম ক'রে মানুষের জীবন ও চিন্তার সমগ্র ক্ষেত্র আলোকিত করে, যেমন ক'রে একটি প্রদীপ, যা আলোকিত করার জন্য জ্বালানো হয়েছিল, তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আলো দেখায়। এইভাবে আমরা দেখি, সত্য সমস্ত তথ্য ঘিরে থাকলেও নিজে তথ্যসমষ্টি মাত্র নয়— সব দিক দিয়ে সত্য তাদের অতিক্রম ক'রে অনন্ত সত্যের দিকে চালিত করে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন চেতনার ক্ষেত্রেও তেমন, মানুষকে কোনো একটি মূল সত্য স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে, সেই সত্য তার দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব বিস্তীর্ণতম ক্ষেত্রে প্রসারিত করবে। উপনিষদও এই লক্ষ্য সামনে নিয়েই বলেছেন, 'নিজের আত্মাকে জানো।!' অথবা, অন্যভাবে বললে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মহান ঐক্যের সত্য রয়েছে তাকে উপলব্ধি করো।

আমাদের সমস্ত স্বার্থকেন্দ্রিক আবেগ, সমস্ত স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা, আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ দৃষ্টি অস্পষ্ট ক'রে দেয়। কারণ তারা শুধু আমাদের ক্ষুদ্র সত্তাকেই দেখায়। যখন আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি, তখন আমরা আন্তরসত্তা প্রত্যক্ষ করি। এই সত্তা আমাদের অহংকে অতিক্রম করে ও সর্বময়ের সঙ্গে গভীরতর সম্বন্ধে যুক্ত হয়।

শিশুরা যখন বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর আলাদা ক'রে শেখে, তখন কোনো আনন্দ পায় না, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তারা ধরতে পারে না; বস্তুত, অক্ষরগুলি যতক্ষণ শুধু নিজেদের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, ততক্ষণ বিচ্ছিন্ন বস্তু রূপে আমাদের শ্রান্ত ক'রে দেয়। তারা আমাদের আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে একমাত্র যখন শব্দে ও বাক্যে যুক্ত হয়ে কোনো ভাব প্রকাশ করে।

এই ভাবে, আমাদের আত্মা যখন নিজের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও আবদ্ধ হয়ে থাকে, তখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কারণ তার মূল বৈশিষ্ট্য হলো ঐক্য। একমাত্র অন্যের সঙ্গে নিজেকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সে তার সত্য খুঁজে পায়, আর শুধু তখনই সে তার আনন্দ লাভ করে। মানুষ যতদিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করতে পারেনি, ততদিন সে বিক্ষুব্ধ ও ভীত অবস্থায় থাকতো; ততদিন জগৎ তার কাছে অপরিচিত ছিল। যে নিয়ম সে আবিষ্কার করেছিল তা সামঞ্জস্যের প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়, মানুষের

আত্মারূপ বিচারবুদ্ধি ও জাগতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তা রয়েছে। এ হলো ঐক্যের বন্ধন, এর মধ্যে দিয়ে যে জগতে সে বাস করে তার সঙ্গে মানুষ সম্বন্ধিত হয়, এবং যখন সে তা আবিষ্কার করে তখন অসীম আনন্দ অনুভব করে, কারণ তখন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে নিজেকে উপলব্ধি করে। কোনো কিছু বুঝতে পারার অর্থ তার মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যা আমাদের একান্ত আপন, এ হলো নিজেদের বাইরে নিজেদের আবিষ্কার যা আমাদের আনন্দিত করে। বোধের এই সম্বন্ধ আংশিক, কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ। প্রেমে ভেদের অনুভূতি মুছে যায় ও মানবাত্মা নিজের সীমা অতিক্রম করে ও অসীমের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে পূর্ণতার মধ্যে তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে। সুতরাং প্রেমই হলো পরম আনন্দ যা মানুষ লাভ করতে পারে, কারণ একমাত্র তার মধ্যে দিয়েই মানুষ জানতে পারে যে নিজের থেকে সে অনেক বড়, ও সর্বময়ের সঙ্গে সে এক।

ঐক্যের এই নীতি যা মানুষের আত্মায় আছে তা সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট্রশাসনকার্য ও ধর্মের মধ্যে দিয়ে দূর ও নিকটের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে সবসময় সক্রিয় থাকে। মানব প্রেমের জন্য যাঁরা ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে আত্মার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন, আমাদের কাছে তাঁরাই মহান দ্রষ্টা। প্রেমের সেবায় তাঁরা অপবাদ ও নির্যাতন, বঞ্চনা ও মৃত্যুর সম্মুখীন হন। তাঁরা আত্মার জন্য জীবন যাপন করেন, ব্যক্তিসত্তার জন্য নয়, আর এইভাবে আমাদের কাছে তাঁরা মনুষ্যত্বের পরম সত্য প্রমাণ করেন। আমরা তাঁদের বলে থাকি, মহাত্মা, "মহান আত্মার মানুষ"।

একটি উপনিষদে বলা হয়েছে, "এমন নয় যে পুত্রকে কামনা করেছো বলে সে তোমার প্রিয়, বরং তুমি নিজের আত্মাকে কামনা করেছো বলে তোমার পুত্র তোমার প্রিয়।"[১] এর অর্থ হলো, যাকেই আমরা ভালবাসি না কেন, তার মধ্যে আমাদের নিজেদের আত্মাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে খুঁজে পাই। এর মধ্যে

আমাদের জীবনের পরম সত্য নিহিত আছে। পরমাত্মা আমার মধ্যে যেমন রয়েছেন, আমার পুত্রের মধ্যেও রয়েছেন, আমার পুত্রে আমার আনন্দ হলো এই সত্যের উপলব্ধি। বাস্তবিক এখন এ যদিও বহু ব্যবহৃত তথ্য হয়ে গেছে, তা হলেও ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আমাদের প্রিয়জনদের আনন্দ ও দুঃখ আমাদেরও আনন্দ ও দুঃখ— শুধু তাই নয়, তার থেকেও বেশী। কেন এমন হয়? কারণ তাদের মধ্যে আমরা আরো বড় হয়ে উঠেছি, তাদের মধ্যে আমরা সেই মহান সর্বানুভূ সত্যকে স্পর্শ করেছি।

এমন প্রায়ই হয় যে আমাদের সন্তান, বন্ধুবান্ধব, আমাদের অন্য প্রিয়জনদের প্রতি প্রেম আরো বেশী আত্মোপলব্ধিতে আমাদের বাধা দেয়। নিঃসন্দেহে, এ আমাদের চেতনার পরিধি প্রসারিত করে, সেইসঙ্গে তার অবাধ বিস্তারের সীমা বেঁধে দেয়। তা সত্ত্বেও, এ হলো প্রথম পদক্ষেপ, আর এই প্রথম পদক্ষেপেই রয়েছে সমস্ত বিস্ময়। আমাদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এ প্রকাশ করে। এর থেকে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে আমাদের আত্মকেন্দ্রিক সত্তার বিনাশে ও সকলের সঙ্গে ঐক্যে রয়েছে আমাদের পরম আনন্দ। এই প্রেমের সীমা আমরা যে পর্যন্ত নির্ধারণ করি সেই পর্যন্ত সে আমাদের নতুন এক শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও মানসিক সৌন্দর্য দেয়, কিন্তু তা শেষ হয়ে যায় যদি সেই সীমার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়, ও প্রেমের মূল ভাবের বিরুদ্ধে যদি তারা সর্বতোভাবে বিদ্রোহ করে; তখন আমাদের সমস্ত বন্ধুত্ব বাধাদায়ক হয়ে ওঠে, আমাদের পরিবারগুলি হয়ে ওঠে স্বার্থপর ও আতিথেয়তাশূন্য, আমাদের রাষ্ট্রগুলি হয়ে ওঠে সংকীর্ণমনা ও অন্য সকল জাতির প্রতি আক্রমণাত্মকরূপে ক্ষতিকর। এ যেন আবদ্ধ পরিবেষ্টনীতে প্রজ্জ্বলিত আলো রাখার মতো, ততক্ষণ তা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে যতক্ষণ না বিষাক্ত বাষ্প পুঞ্জীভূত হয়ে তার শিখা স্তিমিত ক'রে দেয়। তা সত্ত্বেও নিভে যাওয়ার আগে সে তার সত্যতা প্রমাণ ক'রে যায়,

আর অন্ধকারের অস্পষ্ট, অসার ও শীতল প্রভাব বিস্তার থেকে মুক্তির আনন্দ জানিয়ে দিয়ে যায়।

উপনিষদ অনুসারে আত্মচেতনায় রয়েছে বিশ্বচেতনা, ভগবত চেতনার চাবিকাঠি। পরম মুক্তি উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ, ব্যক্তিসত্তার বাইরে নিজেদের আত্মাকে জানা। আমাদের সুনিশ্চিত ভাবে জানতে হবে যে আমরা মূলতঃ আত্মা। এই জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি যদি ব্যক্তিসত্তার উপরে প্রভুত্ব অর্জন করতে পারি, যদি সব রকম গর্ব ও লোভ ও ভয়ের ঊর্দ্ধে উঠতে পারি, যদি জানি যে জাগতিক ক্ষতি ও দৈহিক মৃত্যু আমাদের আত্মার সত্যতা ও মহত্ত্ব থেকে কোনো কিছু নিয়ে নিতে পারে না। মুরগির বাচ্চা যখন আত্মসর্বস্ব বিচ্ছিন্ন ডিমের অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে তখন জানে ডিমের যে শক্ত খোলা তাকে এতদিন ঢেকে রেখেছিল সেটি তার জীবনের কোনো যথার্থ অংশ নয়। সেই খোলা এক নিষ্প্রাণ বস্তু, এর কোনো বৃদ্ধি নেই, এর বাইরে যে বিরাট জগৎ রয়েছে, এক পলকের জন্যেও এ তাকে দেখাতে পারে না। যতই প্রশংসনীয় ভাবে নিখুঁত ও গোলাকার হোক না কেন একে আঘাত করতে হয়, একে ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় ও এই ভাবে মুক্ত আলো ও বাতাস জয় ক'রে নিতে হয়, আর পাখির জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। সংস্কৃতে পাখিকে বলা হয় দ্বিজ: সেই ভাবে অন্ততঃ বারো বছর যে ব্যক্তি আত্মসংযম ও উচ্চ চিন্তার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে যান তাঁরও নামকরণ হয়; তখন তাঁর চাহিদা থাকে সামান্য, অন্তর হয় পবিত্র, আর স্বার্থশূন্য উদার মানসিকতা নিয়ে জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত থাকেন। মনে করা হয় তিনি অহংকারের অন্ধ মোড়ক থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের মুক্তিতে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তিনি প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছেন; সর্বময়ের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

আমার শ্রোতাদের আমি আগেও সতর্ক করেছি, এখনো সেই ধারণার বিরুদ্ধে সতর্ক করা উচিত মনে করছি যে ভারতবর্ষের আচার্যেরা সংসার ত্যাগ ও আত্মত্যাগের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা কেবল অনস্তিত্ব প্রকাশের ভাবলেশহীন অসারতার দিকে নিয়ে যায়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি, অথবা, অন্যভাবে বললে, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে জগৎকে লাভ করা। যিশু যখন বলেছিলেন, 'দুর্বলেরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য, কারণ তারাই পৃথিবীকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে,'' তিনি এ কথাই বুঝিয়েছিলেন। তিনি এই সত্য ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষ যখন অহংকার থেকে নিষ্কৃতি পায় তখন তার প্রকৃত উত্তরাধিকার লাভ হয়। তাকে আর জগতে সংগ্রাম ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ ক'রে নিতে হয় না; আত্মার চিরন্তন অধিকারে এ তার জন্য সর্বত্র সংরক্ষিত থাকে। আত্মার প্রকৃত কর্ম আত্মোপলব্ধিতে অহংকার বাধা দেয়, জগৎ ও জগদীশ্বরের সঙ্গে তার ঐক্য সম্পূর্ণ করার দ্বারা এই উপলব্ধি হয়।

সাধু সিংহকে দেওয়া ধর্মোপদেশে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, ''সিংহ, এ কথা সত্য, যে আমি কর্ম বর্জন করেছি, কিন্তু শুধু সেই কর্ম যা ভাষায়, চিন্তায় বা কর্মে অশুভের দিকে নিয়ে যায়। সিংহ, এ কথা সত্য যে আমি নির্বাপণের উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু তা শুধু অহংকার, লালসা, অশুভ চিন্তা, ও অজ্ঞানের নির্বাপণ, ক্ষমা, প্রেম, করুণা ও সত্যের নয়।''

মুক্তির যে মতবাদ বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন, তা ছিল অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্তি। অবিদ্যা হলো অজ্ঞান যা আমাদের চেতনাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, ও তাকে আমাদের ব্যক্তিসত্তার বেষ্টনীর মধ্যে সীমিত করার চেষ্টা করে। এই অবিদ্যা, এই অজ্ঞান, এই সীমিত চেতনা অহংকারের সুদৃঢ় স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, আর এই ভাবে সমস্ত দম্ভ, আকাঙ্ক্ষা ও নির্মমতার উৎস হয়ে কেবল নিজের স্বার্থ সাধনে প্রাসঙ্গিক হয়। মানুষ যখন ঘুমায় তখন সে তার দৈহিক জীবনের

সংকীর্ণ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সে জীবিত থাকে, কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার জীবনের বিভিন্ন সম্বন্ধ সে জানে না,— অতএব সে নিজেকে জানে না। কাজেই একজন যখন অবিদ্যার জীবন যাপন করে তখন সে নিজের সত্তায় আবদ্ধ থাকে। এ হলো আধ্যাত্মিক নিদ্রা; যে পরম সত্য তাকে ঘিরে রয়েছে, সে সম্বন্ধে তার চেতনা তখন সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে না, সে কারণে তার নিজের আত্মার সত্যতাও সে জানে না। যখন সে "বোধি" লাভ করে, অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার সুপ্ত অবস্থা থেকে পূর্ণ চেতনায় জাগ্রত হয়, তখন সে হয়ে ওঠে বুদ্ধ।

একবার বাংলার কোনো এক গ্রামে আমি এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দুই জন সাধুর দেখা পেয়েছিলাম। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনারা কি আমাকে বলতে পারেন, আপনাদের ধর্মের বিশেষত্ব কিসে আছে?" তাঁদের মধ্যে একজন এক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে উত্তর দিয়েছিলেন, "এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন।" অন্যজন বলেছিলেন, "না, এ অতি সহজ। আমরা মনে করি যে সবার আগে আমাদের আধ্যাত্মিক গুরুর পথ নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের নিজেদের আত্মাকে জানতে হয়, আর যখন আমরা তা পারি, তখন আমাদের অন্তরে যে পরমাত্মা আছেন তাঁকে পাই।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনাদের মতবাদ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে আপনারা প্রচার করছেন না কেন?" তাঁর উত্তর ছিল, "যে তৃষ্ণার্ত, সে নিজেই নদীর কাছে আসবে।" "কিন্তু তা হলে, আপনি কি তা দেখেছেন? তারা কি আসছে?" প্রশান্ত হাসি হেসে, ও বিন্দুমাত্র অধৈর্য না হয়ে বা দুশ্চিন্তা না ক'রে, তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তাদের সবাইকে আসতে হবে, একযোগে ও আলাদাভাবে।"

হ্যাঁ, গ্রামবাংলার এই সহজ সরল সাধু ঠিকই বলেছিলেন। মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার অন্নবস্ত্রের থেকে আরও বড় প্রয়োজন মিটানোর জন্য বাইরে বেরিয়েছে।

সে নিজেকে খুঁজতে বেরিয়েছে। মানব ইতিহাস মানুষের অবিনশ্বর সত্তার— তার আত্মার উপলব্ধির অনুসন্ধানে অজানার দিকে যাত্রার ইতিহাস। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে; প্রাচুর্যের সুবিশাল স্তূপ তৈরী ক'রে এবং নির্মম ভাবে সেগুলি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে; তার স্বপ্ন ও উচ্চাশাকে রূপ দিয়েছে এমন প্রতীকের প্রকাণ্ড সব মূর্তি সৃষ্টি ক'রে ও পুরনো হওয়া শৈশবের খেলনার মতো তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে; যে বিস্ময়কর চাবি দিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় তাকে জাল ক'রে এবং বহু যুগের এই পরিশ্রম ছুঁড়ে ফেলে নিজের কর্মশালায় ফিরে এসে কোনো নতুন রূপে আবার কাজ শুরু করার মধ্যে দিয়ে; হ্যাঁ, এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে মানুষ যুগ যুগান্তর ধরে আত্মার পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে,— মানুষ যা কিছু স্তূপাকার করছে, যে কাজ সম্পূর্ণ করছে, যত তত্ত্ব তৈরী করছে, আত্মা সেই সব কিছুর থেকে মহত্তর; এই আত্মার অগ্রগতি মৃত্যু বা বিচ্ছেদে কখনো রুদ্ধ হয় না। মানুষের ভুল ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা কোনো দিক দিয়েই ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ছিল না, তার পথের উপর তারা অতিকায় ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রেখেছিল; এক দানব শিশুর জন্মের জন্য প্রসব বেদনার মতো তার দুঃখ কষ্ট ছিল অপরিমেয়; সে সব ছিল এক পরিপূর্ণতার ভূমিকা যার পরিধি অসীম। মানুষ নানাভাবে শহীদ হয়েছে এখনো হয়ে চলেছে, এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলি সে পূজাবেদী রূপে নির্মাণ করেছে যেখানে সে প্রতিদিন বিস্ময়কর ও পরিমাণে অবিশ্বাস্য রকম প্রকাণ্ড বলি নিয়ে আসে। এসবই তার কাছে একেবারে অর্থহীন ও অসহনীয় হয়ে উঠতো, যদি সে পুরোপুরি একটানা মনের মধ্যে গভীরতম আত্মিক আনন্দ অনুভব না করতো, এই আনন্দ দুঃখের মধ্যে দিয়ে নিজের দৈব শক্তি পরীক্ষা করে ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নিজের অফুরন্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করে। হ্যাঁ, তাঁরা আসছেন, সেই তীর্থ যাত্রীরা, সকলে একযোগে ও আলাদাভাবে— আসছেন তাঁদের জগতের প্রকৃত উত্তরাধিকার

নিতে; ক্রমাগত তাঁরা তাঁদের চেতনা বিস্তার করছেন, সর্বদা উন্নততর ঐক্যের অনুসন্ধান করছেন, ক্রমাগত সেই এক সর্বব্যাপী মূল সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

মানুষের দারিদ্র্য অতলস্পর্শী, যতক্ষণ সে তার আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃতই সচেতন না হয়ে ওঠে তার অভাব থাকে অন্তহীন। ততক্ষণ, তার কাছে জগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল— এক অলীক ছায়ামূর্তি যা আছে ও নেই। যিনি আত্মোপলব্ধি করেছেন তাঁর কাছে জগতের একটি নির্ধারিত কেন্দ্র রয়েছে যার চতুর্দিকে অন্য সব কিছু সঠিক স্থান পেতে পারে, এবং শুধু সেখান থেকেই তিনি এক সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের মহিমা উপভোগ করতে পারেন।

এক সময় পৃথিবী যখন এক নীহারিকাপুঞ্জের মতো ছিল তখন তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি সম্প্রসারণশীল তাপের বেগে অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল; তখনও সে কোনো নির্দিষ্ট আকার পায়নি ও তার কোনো সৌন্দর্যও ছিল না সার্থকতাও ছিল না, কিন্তু কেবল ছিল তাপ ও বেগ। ক্রমে ক্রমে, এক শক্তি সমস্ত বিক্ষিপ্ত পদার্থকে এক কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করেছিল ও পৃথিবীর সমস্ত বাষ্প সেই শক্তির মাধ্যমে যখন গোলাকার বৃত্তে সংহত হয়ে এক হয়েছিল, তখন সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে হীরের মণিমালায় পান্নার লকেটের মতো সেও তার যথাস্থান লাভ করেছিল। আমাদের আত্মার ক্ষেত্রেও সেইরকম। যখন অন্ধ আবেগ ও আসক্তির তাপ ও বেগ তাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, তখন আমরা যথার্থ ভাবে কিছু দিতেও পারি না নিতেও পারি না। কিন্তু যখন আমরা আত্মসংযমের শক্তি দিয়ে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলিক তত্ত্বকে সংহত ক'রে ও বিচ্ছিন্ন সব কিছুকে এক ক'রে আত্মাতে আমাদের কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পাই, তখন আমাদের সমস্ত বিচ্ছিন্ন ধারণা প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, আর আমাদের অন্তরের সমস্ত ক্ষণস্থায়ী আবেগ প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে; তখন

আমাদের জীবনের ছোটখাটো সমস্তই এক অনন্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, আর আমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম এক অন্তর্নিহিত ঐক্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিজেদের যুক্ত করে।

উপনিষদ বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, "সেই এক আত্মাকে জানো।"[৭] "অমৃতের এই হলো সেতু।"[৮]

এই হলো মানুষের চরম লক্ষ্য, তার মধ্যে যে এক রয়েছেন, তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া; এই তার সত্য এই তার আত্মা; এই চাবি দিয়ে সে তার আধ্যাত্মিক জীবনের, তার স্বর্গরাজ্যের দ্বার খোলে। তার আকাঙ্ক্ষা অনেক, জগতের নানা বিষয়ের দিকে তারা উন্মাদের মতো ছোটে, কারণ তার মধ্যে এদের জীবন ও তৃপ্তি রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে যে এক রয়েছেন তিনি সর্বদা ঐক্যের সন্ধান করছেন— জ্ঞানে ঐক্য, প্রেমে ঐক্য, অভীষ্ট লক্ষ্যে ঐক্য; শাশ্বত ঐক্যের মধ্যে সে যখন অসীমে উপনীত হয় তখনই তার পরমানন্দ। এই জন্য উপনিষদে বলা হয়, "এক রূপকে যিনি বহুধা করেছেন তাঁকে নিজেদের আত্মার মধ্যে উপলব্ধি ক'রে ধীর ব্যক্তিরা শাশ্বত সুখ লাভ করেন অন্য কেউ নন।"[৯]

জগতের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের অন্তরে যে এক রয়েছেন তিনি সর্বভূতে বিরাজিত একের দিকে সূত্রাকারে তাঁর পথ ক'রে চলেছেন; এই তাঁর স্বরূপ ও এই তাঁর আনন্দ। কিন্তু সেই ঘোরানো পথে তিনি কখনোই তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতেন না যদি না তাঁর নিজস্ব আলোর এক ঝলকে তিনি যা খুঁজছেন তা না দেখতে পেতেন। আমাদের নিজেদের অন্তরাত্মায় পরমাত্মার দর্শন এক সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ অনুভূতি, আদৌ কোনো যুক্তি প্রয়োগ বা প্রমাণ ভিত্তিক নয়। আমাদের চোখের স্বভাব হলো সে কোনো বস্তুকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র ক'রে দেখে, সে সমস্ত অংশকে একত্রিত ক'রে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে। এই ভাবে আমাদের আত্ম-চেতনার দৃষ্টি যখন

খোলে তখন সেও তেমনি স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ ভাবে পরম একের সঙ্গে তার ঐক্য উপলব্ধি করে।

উপনিষদ বলেন, "এই দেবতা, বিশ্বকর্মা, মহাত্মা রূপে সর্বদা মানবহৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। যাঁরা, তাঁকে অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তাঁরা অমৃত হন।"*

তিনি বিশ্বকর্মা; তার অর্থ, প্রকৃতির বহু রূপ ও শক্তির মধ্যে তাঁর বহিঃপ্রকাশ; কিন্তু তাঁর আন্তর প্রকাশ রয়েছে আমাদের আত্মায় পরম একরূপে। এই জন্য প্রকৃতির রাজ্যে আমাদের সত্য অন্বেষণ চলে বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের ক্রমিক পদ্ধতিতে, কিন্তু আমাদের আত্মায় সত্য চেতনা আসে অব্যবহিত ও অপরোক্ষ অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। অনন্তকাল ধরে অল্প অল্প ক'রে ধারাবাহিক জ্ঞানের সংযোজন করলেও আমরা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারি না, কারণ তিনি এক, নানা অংশ দিয়ে তিনি সৃষ্ট নন; আমরা তাঁকে একমাত্র আমাদের হৃদয়ের হৃদয় ও আত্মার আত্মা রূপে জানতে পারি; যখন আমরা স্বার্থ ত্যাগ করি ও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াই একমাত্র তখন প্রেম ও আনন্দ অনুভবের মধ্যে তাঁকে জানতে পারি।

মানব হৃদয় থেকে উৎসারিত গভীরতম ও আন্তরিকতা পূর্ণ শাশ্বত প্রার্থনা আমাদের সুপ্রাচীন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল: "হে স্বপ্রকাশ আমার মধ্যে প্রকাশিত হও।"* আমরা দুঃখে থাকি কারণ আমরা অহংসর্বস্ব জীব— এই অহং বশ্যতা স্বীকার করে না ও সে সীমাবদ্ধ, এ কোনো আলো প্রতিফলিত করে না, অসীম সম্বন্ধে এ অন্ধ। আমাদের অহং উচ্চরবে ক্রমাগত বেসুরে কলরব করে— এ সুরে বাঁধা বীণা নয়, যার তারগুলি অনাদি অনন্ত সঙ্গীতে স্পন্দিত। অসন্তোষের দীর্ঘশ্বাস ও অসাফল্যের ক্লান্তি, অতীতের জন্য অমূলক বেদনা ও ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা আমাদের অগভীর চিত্তকে মথিত করে, কারণ আমরা আমাদের

আত্মার সাক্ষাৎ পাইনি, আর প্রকাশস্বরূপ আত্মা আমাদের মধ্যে ব্যক্ত হননি। তাই আমাদের প্রার্থনা, "হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখের দ্বারা আমাদের নিয়ত রক্ষা করো।"[৭] এই আত্মতুষ্টি, এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই অধিকারের গর্ব, হৃদয়ের স্বভাব-বহির্ভূত এই ঔদ্ধত্য, এই হলো মৃত্যুর শ্বাসরুদ্ধকর ছায়া। "হে রুদ্র, এই অন্ধকার আবরণ ভেদ ক'রে দাও। এই অন্ধকার রাত্রি ভেদ ক'রে তোমার কৃপার সহাস্য কিরণ আসুক ও আমার আত্মাকে জাগ্রত করুক।"

"অসৎ থেকে আমাকে সৎ স্বরূপে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিঃ স্বরূপে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত স্বরূপে নিয়ে যাও।"[৮] কিন্তু কী ক'রে একজন আশা করতে পারে যে এই প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে? কারণ সত্য ও অসত্য, মৃত্যু ও অমরত্বের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। তবে এই দুস্তর ব্যবধানে এক মুহূর্তেই সেতুবন্ধন হয় যখন সেই এক প্রকাশস্বরূপ নিজেকে জীবাত্মায় প্রকাশ করেন। সেখানে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে, কারণ সেখানে সসীম ও অসীমের মিলনক্ষেত্র রয়েছে। "হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করো।"[৯] কারণ পাপে মানুষ সসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই অসীম তারই মধ্যে রয়েছেন। এ হলো অহং এর দ্বারা তার আত্মার পরাজয়। বিপজ্জনক এই পরাজয়ের খেলায় কিছু লাভ করার জন্য মানুষ তার সর্বস্ব পণ রাখে। সত্যকে কলঙ্কিত ক'রে পাপ আমাদের চেতনার শুদ্ধতাকে ম্লান করে। পাপে আমরা আকুল হয়ে সুখের আকাঙ্ক্ষা করি, তার কারণ এই নয় যে তারা যথার্থ কাম্য, কিন্তু তার কারণ আমাদের আকাঙ্ক্ষার লাল আলোয় তাদের আকাঙ্ক্ষিত দেখায়; আমরা সাগ্রহে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি তার কারণ এই নয় যে তারা নিজেরা মহৎ, বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্যায় ভাবে বাড়িয়ে তোলে ও তাদের বড় ক'রে দেখায়। এই সমস্ত অতিরঞ্জন, এই সমস্ত বস্তু বিষয়ক মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি পদক্ষেপে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট

করে; আমরা মূল্যবোধের প্রকৃত আদর্শ হারিয়ে ফেলি ও পরস্পর প্রতিযোগী জীবনের নানা আকর্ষণের মিথ্যা দাবি আমাদের বিক্ষিপ্ত করে। নিজের প্রকৃতির সমস্ত উপাদানকে পরম একের ঐক্য ও শাসনের অধীনে নিয়ে আসার ব্যর্থতায় মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করে এবং তখন ঐকান্তিক প্রার্থনা উদিত হয়, "হে দেব, হে পিতা আমাদের পাপ সকল বিদূরিত করো।"[১০] "যা মঙ্গলকর তা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো।"[১১] এই মঙ্গল প্রতিদিন আমাদের আত্মার পুষ্টি সাধন করে। সুখে আমরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ, মঙ্গলে আমরা মুক্ত ও সকলের সঙ্গে এক হয়ে থাকি। মাতৃজঠরে শিশু যেমন মায়ের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের পুষ্টি লাভ করে, সেইরকম আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় মঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, এই মঙ্গল অনন্তের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের স্বীকৃতি, তার যোগাযোগের পথ, কারণ অনন্তের দ্বারা সে পরিবেষ্টিত ও পুষ্ট। এই জন্য বলা হয়, "তাঁরা আশীর্বাদ ধন্য, যাঁরা ন্যায়পরায়ণতার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করেন: এই জন্য তাঁরা পরিপূর্ণ হবেন।" এর যুক্তি, ন্যায়পরায়ণতা আত্মার ঐশ্বরিক পুষ্টি সাধন করে; এ ছাড়া অন্য কিছু মানুষকে পূর্ণ করতে পারে না, তাকে দিয়ে অক্ষয় জীবন যাপন করাতে পারে না, অনাদি অনন্তের দিকে তার উন্নতিতে সহায় হতে পারে না। "যাঁর থেকে আমাদের জীবনে সুখ সেই তোমাকে নমস্কার।"[১২] "যাঁর থেকে আমাদের আত্মার মঙ্গল সেই তোমাকেও নমস্কার"[১৩] "কল্যাণ ও কল্যাণতর সেই তোমাকে নমস্কার।"[১৪] তাঁর মধ্যে আমরা সব কিছুর সঙ্গে শান্তিতে ও সমন্বয়ে, মঙ্গলে ও প্রেমে ঐক্যবদ্ধ।

প্রকাশের সম্পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য মানুষ ব্যাকুল। নিজেকে প্রকাশ করার এই আকাঙ্ক্ষাই তাকে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু তাকে আবিষ্কার করতে হবে যে স্তূপীকৃত করা আর উপলব্ধি করা এক নয়। তার অন্তরের আলো তাকে প্রকাশ করে, বাইরের সামগ্রী নয়। যখন এই আলো প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন

এক মুহূর্তে সে জানে যে মানবের সর্বোচ্চ প্রকাশ হলো তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ। আর এর জন্য মানুষের আকুতি— তার আত্মার প্রকাশ, তার আত্মার মধ্যে ঈশ্বরেরই প্রকাশ। মানুষ পূর্ণ মানব হয়ে ওঠে, তার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে, যখন তার আত্মা পরমাত্মার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে, এই পরমাত্মাই "আবিঃ", অভিব্যক্তি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

মানুষের প্রকৃত দুঃখ এই সত্যের মধ্যে রয়েছে যে সে পূর্ণ প্রকাশিত হতে পারেনি, সে স্বতঃ অজ্ঞাত রয়েছে, নিজের বাসনার মধ্যে হারিয়ে গেছে। সে পারিপার্শ্বিকের বাইরে নিজেকে অনুভব করতে পারে না, তার বৃহত্তর সত্তা মুছে গেছে, তার সত্য অনুপলব্ধ থেকে গেছে। এইজন্য তার সমগ্র সত্তার থেকে এই প্রার্থনা উৎসারিত হয়, "হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।"[১৩] মানুষের মধ্যে দৈহিক পুষ্টি সাধনের জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণার থেকে, ধন ও মানের জন্য লোভের থেকে আত্মার পূর্ণ প্রকাশের এই আকুল আকাঙ্ক্ষা অনেক গভীরে সমবেত। এই প্রার্থনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভাবে তার মধ্যে জন্মায়নি; এই প্রার্থনা সমস্ত বস্তুতে নিগূঢ়, এই প্রার্থনা তার মধ্যে "আবিঃ", নিত্য প্রকাশমান আত্মার নিরন্তর অনুপ্রেরণা। সীমার মাঝে অসীমের যে প্রকাশ সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তারা ভরা আকাশের মধ্যে, ফুলের সৌন্দর্যের মধ্যে তা পূর্ণ রূপে দেখা যায় না! তা রয়েছে মানুষের আত্মায়। কারণ সেখানে ইচ্ছা ইচ্ছার মধ্যেই তার প্রকাশ খোঁজে, এবং সমর্পণের স্বাধীনতায় স্বাধীনতা তার শেষ পুরস্কার জয় করার দিকে ঝোঁকে।

সেইজন্য মানবাত্মায় জগদীশ্বর তাঁর সিংহাসনের ছায়া ফেলেননি— তাকে মুক্ত রেখেছেন। যেখানে মানুষ শারীরিক ও মানসিক গঠনে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, সেখানে জগদীশ্বরের নিয়ম তাকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, কিন্তু তার আত্মায় তাঁকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা তার আছে। সেখানে আমাদের ঈশ্বরকে তাঁর

প্রবেশাধিকার জয় ক'রে নিতে হয়। তিনি সেখানে অতিথি রূপে আসেন, রাজা রূপে নয়, আর সেই কারণে আহ্বান না আসা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। মানবাত্মার কাছ থেকে ঈশ্বর তাঁর আদেশ প্রত্যাহার ক'রে নেন, কারণ সেখানে তিনি আসেন আমাদের প্রেমের প্রার্থী হয়ে। প্রকৃতির নিয়ম, তাঁর সশস্ত্র বাহিনী, প্রবেশ পথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর শুধু মাত্র তাঁর প্রেমের দূত, সুন্দর, মানবাত্মার পরিপার্শ্বে প্রবেশাধিকার পায়।

একমাত্র ইচ্ছার এই ক্ষেত্রে অরাজকতার অনুমোদন রয়েছে; শুধু মানবসত্তাতে বিরোধ সৃষ্টিকারী অসত্য ও অনৈতিকতা আধিপত্য করে; আর সবকিছু এমন অবস্থায় পৌঁছাতে পারে যে আমরা যন্ত্রণায় কেঁদে বলতে পারি, "জগদীশ্বর থাকলে এমন অরাজকতা কখনো প্রভাব বিস্তার করতো না।" প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আমাদের সত্তার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানে তাঁর পর্যবেক্ষণ করার ধৈর্যের কোনো সীমা নেই, এবং সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে যদি দ্বার বন্ধ থাকে, তিনি শক্তি প্রয়োগ ক'রে কখনো খোলেন না। তার কারণ আমাদের এই সত্তাকে পরমার্থ রূপে আত্মাকে পেতে হয়, ঈশ্বরের ক্ষমতার শাসনে নয়, বরং প্রেমে, আর এই ভাবে মুক্তিতে সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি একাত্ম হয়ে গেছেন, মানুষের সামনে তিনি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে দাঁড়ান। সেখানে মানুষ সত্যের মধ্যে তার স্বরূপ খুঁজে পায়; কারণ সেখানে তার কাছে মানবাত্মাতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ রূপে "আবিঃ" অভিব্যক্ত হন; সেখানে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার, অনন্ত প্রেমের সঙ্গে আমাদের প্রেমের মিলন দেখি।

এই কারণে, আমাদের দেশে ঈশ্বরকে যিনি আন্তরিক ভাবে ভালবাসেন মানুষের কাছে তিনি এমন শ্রদ্ধা পান পশ্চিমে যা প্রায় অপবিত্রকরণ ব'লে গণ্য

হবে। আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূরণ হতে দেখি, তাঁর প্রকাশে কঠিনতম বাধা বিপত্তির অপসারণ দেখি, এবং ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আনন্দ মনুষ্যত্বে পূর্ণ বিকশিত হতে দেখি। তাঁর মাধ্যমে আমরা দেখি এক ঐশ্বরিক আন্তরিকতায় সমগ্র মনুষ্য জগৎ আচ্ছাদিত হয়ে আছে। ঈশ্বর-প্রেমে প্রদীপ্ত তাঁর জীবন আমাদের সমস্ত পার্থিব প্রেমকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। আমাদের জীবনের সমস্ত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, সমস্ত সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা, এই ঐশ্বরিক প্রেমের আকর্ষণীয় প্রদর্শনকে ঘিরে সঙ্ঘবদ্ধ হয় ও নাটকীয় রূপ নেয়, আমরা তার সাক্ষী থাকি। এক অনন্ত রহস্যের স্পর্শ অতি তুচ্ছ ও সুপরিচিতকে উপেক্ষা করে অনির্বচনীয় সঙ্গীতের প্রকাশ করে। গাছ, তারা, নীল পাহাড় বিরামহীন বেদনায় অনির্বচনীয় অর্থের প্রতীক হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। যখন মানবাত্মা আমিত্বের ভারী পর্দা পাশে সরিয়ে দেয়, যখন তার অবগুণ্ঠন উঠে যায়, আর সে তার শাশ্বত প্রেমিকের সামনে এসে দাঁড়ায়, মনে হয় আমরা সৃষ্টিকর্তাকে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে দেখছি।

কিন্তু এই অবস্থা কেমন? এ হলো বসন্তের সকালের মতো, জীবন ও সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, অথচ এক ও অখণ্ড। মানুষের জীবন যখন অস্থিরতা থেকে উদ্ধার পেয়ে আত্মার মধ্যে তার ঐক্য খুঁজে পায়, তখন অসীমের চেতনা, অগ্নিশিখার কাছে আলোর মতো, অপরোক্ষ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। জীবনের সমস্ত বিরোধ ও বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধিত হয়; জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মিলন হয়; আনন্দ ও বেদনা সুন্দরের মধ্যে এক হয়ে যায়, ভোগ ও ত্যাগ মঙ্গলের মধ্যে সমান হয়ে যায়; সসীম ও অসীমের ব্যবধান প্রেমে পূর্ণ হয় ও প্লাবিত হয়; প্রতি মুহূর্ত চিরন্তনের বার্তা নিয়ে আসে; সেই নিরাকার ফুল, ফলের আকারে আমাদের কাছে প্রতিভাত হন; একজন পিতার মতো সেই অসীম আমাদের গ্রহণ করেন ও বন্ধুর মতো আমাদের পাশে পাশে

চলেন। একমাত্র আত্মা, মানুষের অন্তরের সেই এক, স্বরূপতঃ সমস্ত সীমা অতিক্রম করতে পারেন, এবং পরম একের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পান। যতক্ষণ আমরা আমাদের অন্তরের সামঞ্জস্য, আমাদের অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা লাভ না করি, আমাদের জীবন অভ্যাসের জীবন হয়ে থাকে। জগৎ এখনও আমাদের কাছে যন্ত্র রূপে প্রতিভাত, যেখানে সে ব্যবহারযোগ্য সেখানে তাকে আয়ত্তে আনতে হবে, যেখানে সে বিপজ্জনক সেখানে তার থেকে রক্ষা পেতে হবে, আর আমাদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সাহচর্যে তাকে কখনোই জানা যাবে না, তার বাহ্য প্রকৃতিতে ও আধ্যাত্মিক জীবনে ও সৌন্দর্যে সমান ভাবে তাকে জানা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

২. তমেবৈকং জানথ আত্মানম্।

৩. অমৃতস্যৈষা সেতুঃ।

৪. একং রূপং বহুধা যঃ করোতি— তম্ আত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।

৫. এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।

৬. আবিরাবির্ময়েধি।

৭. রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

৮. অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

৯. বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
১০. বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
১১. যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।
১২. নমঃ সম্ভবায়।
১৩. নমঃ শঙ্করায় চ।
১৪. নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।
১৫. আবিরাবির্ম্মএধি।